National Conference on
Latest Innovations in Engineering, Science, Management and Humanities (NCLIESMH- 2024)
26th May, 2024, Raipur, Chhattisgarh, India.

CERTIFICATE NO : NCLIESMH /2024/C0524511

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ভাষা শৈলীর সামগ্রিক অধ্যয়ন

Prasanta Das, Dr. Madhusudhan Adhikary
Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

ভূমিকা:

বাংলা কথাসাহিত্যের পথ পরিক্রমায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত সাহিত্যধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থক পদার্পণ ঘটল বিশ শতকে। উপন্যাস-শিল্পের তখন এক ঐশ্বর্য পর্ব। উপন্যাস সাহিত্যের সমৃদ্ধি এই দুই অসাধারণ শিল্পীর প্রভাবে ছিল বর্ণবহুল-মাত্রাময়। উপন্যাসের গঠনকৌশল চরিত্রায়ণ ও ভাষাশিল্প সবই তখন সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুত অবসিত- কালের ইতিহাসের পটভূমি থেকে উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন ও তাঁর অসামান্য কল্পনাশক্তির যাদুতে অতিক্রান্ত ইতিহাসের পটভূমিকায় শাশ্বতকালের মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিময় ও অন্তর্দ্বন্দ্বপীড়িত ট্র্যাজিক ভাবনাকে তুলে ধরলেন। উপন্যাস তাঁর প্রতিভাস্পর্শে বর্ণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যময় ও মহিমান্বিত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাহ্যিক বর্ণচ্ছটা ও উদার গাম্ভীর্যের স্থানে সূক্ষ্ম অন্তর্মুখীনতা ও সর্বাঙ্গীন কাব্যময় সৌন্দর্যের দীপ্তি দেখা দিল। মনোজগতের রহস্যময় জটিলতা দুঃখবেদনার দহনজ্বালার পঙ্কিল গ্লানিময় কদর্যতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিশীলিত মনন শিল্পময় রূপ পেল। সমাজনীতির আদর্শ প্রচার না করে মানুষের প্রচ্ছন্ন হৃদয়বৃত্তির শিল্পময় প্রকাশে কবি ও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ মগ্ন ছিলেন।

সাহিত্যে ঐতিহ্য অনুসরণের দিক থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই পূর্বসুরী শিল্পাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিষয়-নির্বাচন সমাজ সম্পর্কিত সমস্যার উত্থাপনে ও বর্ণনা রীতিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনেকটাই অনুসরণ করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মতবাদ ও অতিরিক্ত মাত্রায় নীতিপ্রাণতাকে যুগোচিত প্রবণতা অনুসারে প্রতিবাদ জানালেন আধুনিক শরৎচন্দ্র, তাই ভাষাও সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়।

মূল বিষয়বস্তু

শরৎচন্দ্রের উপর তাঁর দুই পূর্বসীর প্রভাব সম্পর্কে সমালোচক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "গোরার ভাষা ঋজু প্রাঞ্জল নিরলঙ্কার প্রসাদগুণ বিশিষ্ট"। শরৎচন্দ্রের ভাষায় এই সব গুণের অভাব নেই, শিশুভাবালুতাও রোমান্স অতিরেকে মাঝেমাঝে ভাষার শিল্প সংযম নষ্ট করেছে। তবু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বীরবলের মত শক্তিশালী গদ্য শিল্পীদের প্রভাব অস্বীকার করে একটিমাত্র ভাষারূপে শতাব্দীর একপাদ শরৎচন্দ্র অবিচল নিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' ও শেষ উপন্যাস 'শুভদা'। কয়েকেটি প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখলেও শরৎচন্দ্র মুখ্যত কথা গদ্যের শিল্পী। তাঁর গদ্য কথা গদ্য রূপেই বিচার্য।"[৭] শরৎচন্দ্রের সমকালীন সবুজপত্র, ভারতী, প্রবাসী, বিচিত্র, কল্লোল ইত্যাদি পত্রিকার দুজন কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় সাধু-গদ্য রীতিকে অবলম্বন করেছিলেন। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর মন্তব্য –

"প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের স্টাইলে প্রধান গুণ এই যে, এখানে তথা কথিত সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার সমন্বয় হইয়াছে। চলিত ভাষার স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এবং সাধু ভাষার সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য গঠন করিয়াছেন।"

শরৎচন্দ্রের লেখনীর বাইরের কাঠামো সাধুগদ্যে হলেও সংলাপ ছিল চলতি গদ্যের। তিনি সাধু ও চলিত গদ্যের মাঝে কোন ব্যবধান মানতে রাজি ছিলেন না।" এই ভাষা সম্পর্কিত স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

"এ ভাষার শক্তি এইখানে যে এ অবাধ নিরবিছিন্ন প্রবাহের মত একটানা অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখো।"

এছাড়া তাঁর গদ্যাংশে ছন্দময়তা, ধ্বনিসজ্জা, কাব্যময়তা, উপমা, উৎপ্রেক্ষণ অলংকারের প্রয়োগে ভাষা ব্যঞ্জনা শিল্পময় হয়ে উঠেছিল। তাঁর ভাষাশিল্প সম্পর্কে সমালোচক সুকুমার সেন বলেছেন -

"শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ এই যে, ইহা গল্পরসবাহী, স্বচ্ছ মনোরম এবং পর্যাপ্ত ।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে কালের পর্যায়ে সাজালে দেখা যায়- 'বড়দিদি' (১৯১৪ খ্রি:) থেকে 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) পর্যন্ত পরিসীমা। কিন্তু 'শুভদা' উপন্যাসটি প্রকদম প্রথম পর্বের উপন্যাস হলেও মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। 'বড়দিদি' উপন্যাসটি ১৯০৭ সালে এবং পত্রিকায় এবং ১৯৪৩ খ্রিঃ পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। এখানে সাধু গদ্যে ভাষার বিবরণী এবং চরিত্রের মুখের ভাষা ছিল চলিত গদ্যে। সাধুগদ্যে উৎপ্রেক্ষণ অলংকারের প্রয়োগ হয়েছে এভাবে "এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ করিয়া জ্বালিয়া উঠিতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা এমন একজন লোক থাকা প্রয়োজন, সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।"

সরল ও জটিল বাক্য সমন্বয় বিবরণটিতে বিবৃত হয়েছে। এই উপন্যাসে আলাদাভাবে প্রকৃতির বর্ণনা না হয়ে মানবচিত্তের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে – "কিন্তু যেদিন হইতে মাধবী তাহার ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত রূপ, স্নেহ মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন চাইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে।"[১৩] প্রকৃতি এখানে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়া এই উপন্যাসে ভাষা আলোচনা করতে গেলে গঠনগত কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়- যেমন- সংক্ষিপ্ত বাক্য, হাইফেন সহযোগে বাক্যাংশে প্রয়োগ। 'আ', 'ত', 'তাই' ইত্যাদি অব্যয় এবং বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক ব্যবহার। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' প্রথম ভারতবর্ষ পত্রিকায় হয় এবং ১৯১৪ সালে 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স' থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় গঠিতা এখানে চরিত্র নীলাম্বর যে অশিক্ষিত গোঁয়ার অথচ পরোপকারী। তার সাথে অপরূপ সুন্দরী বিরাজের সাথে জটিলতা ও হৃদয়ের বিক্ষুব্ধ তীব্রতা ব্যক্ত হয়েছে। স্বামী কর্তৃক মিথ্যে অভিযোগী দায়ী হয়ে তীব্র অভিমানে গৃহত্যাগ করে। অবশেষে স্বামীর কোলে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করে। এই করুণ কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। উপন্যাসের শুরুতে চরিত্রের বিবরণ সাধু গদ্যে রচিত হয়েছে 'হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাম্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্তন গাহিতে খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল।"

সরল ও যৌগিক বাক্যে বিবরণটি সাধু গদ্যে বর্ণিত হয়েছে। পোড়াইতে, 'গাহিতে', 'বাজাইতে', খাইতে' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।।

চলিত গদ্যে বিরাজের মুখে ভাষা স্পন্দিত হয়েছে এভাবে- "এই আশীর্বাদ কর যদি জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি। যদি যথার্থ 'সতী' হই, যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি- তার পরে এই পায়ে মাথা রেখে যেন মরি যেন এই সিদুর এই নোয়া নিয়েই চিতায় শুতে পাই।"

ভাই উক্তির মাধ্যমে পতিপ্রেমের একনিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। এই উপন্যাসের ভাষায় অলংকারের প্রয়োগে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে - "সুতীক্ষ্ণ বাজের আলো এক মুহূর্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোট বৌ, তেমনই করিয়া তাহার বুকের অন্তস্থল পর্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল।"

উপন্যাসে প্রকৃতি জগৎ বর্ণনা পেয়েছে এভাবে- "বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদু প্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কুল ভাসাইয়া চলিয়াছে... তাহার পায়ের নীচে কালো পাথর মাথার উপর মেঘাচ্ছিন্ন কালো আকাশ, সুমুখে কালো জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ স্তব্ধ বনানী।"

শরৎচন্দ্রের পরবর্তী 'পণ্ডিতমশাই' রচনাটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২১ সালে বৈশাসে ও শ্রাবণ সংখ্যায় এবং পরবতী সময়ে 'এম. সি. সরকার বাহাদুর এন্ড সন্স' নামক প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯১৪ খ্রিঃ পুস্তকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটিতে সাধুগদ্যের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে এভাবে,-"গগনে আলোর আভাস, ওখানো ফুটিয়া উঠে নাই বটে কিন্তু মেঘমুক্ত নির্মল স্বচ্ছ আকাশের তলে ভবিষ্যত জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতে।"

যৌগিক বাক্যে একাধিক বিশেষণ পদ 'মেঘমুক্ত', 'স্বচ্ছ' ইত্যাদির ব্যবহার সাধু গদ্যে পাঠকের হৃদয়ে প্রসন্নতা আনে। চরিত্রের মুখে চলিত গদ্যের ভাষা ব্যবহার হয়েছে এভাবে-

"তবু সেই রাগের কথা। কুসম শুনি তুমি অনেক শিখেছে, কিন্তু মেয়ে মানুষ হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড় শেখা এটা কেন শেখেনি। কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস, ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে কার হাতে হয় বল।"[১৯]

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩২২ সালে আশ্বিন, অগ্রহায়ন ও পৌষ সংখ্যায় এবং পরে ১৯১৬ খ্রীঃ ১৫-ই জানুয়ারী বই আকারে প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসে পল্লী বাংলার সমাজ ও তার বহুবিধ সমস্যা জটিলতা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে পূর্বাভাস আছে। রেনী ঘোষাল, জ্যাঠাইমা ও আরও অনেকের স্বার্থপরতা উদারতাও ঈর্ষাপরায়নতার প্রকাশ ঘটেছে। সাধু গদ্যে - "কারা প্রাচীরের বাহিরে যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়া ছিলেন, বোধ

করি উন্মও বিকারের ইহা রমেশের আশা করা সম্ভবপর ছিল না"[২০]

রমার কণ্ঠে চলিত গদ্যের ব্যবহার হয়েছে যথাযথ- "মানে যদি কখনও শুনতে পাও সেদিন শুধু এই কথাটি মনে করো, আমি কেমন করে, নিঃশব্দে সহ্য করে চলে গেছি - একটি কথাও প্রতিবাদ করিনি। "

'দত্তা' উপন্যাসটি ১৩২৪ সালে পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৫ সালের বৈশাখ - ভাদ্র সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স' থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। বিজয়ের সাথে নরেনের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং প্রেম বিহ্বল আতি সহজ গদ্য ভাষায় বিবৃত হয়েছে। সাধুগদ্যে চিত্রগ্রাহ্যতা এনেছে এভাবে – "তাহার বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। লোকটি দীর্ঘাঙ্গ। কিন্তু তদানুপাতে হৃষ্টপুষ্ট নয়, বরঞ্চ কৃশ। বর্ণ উজ্জ্বল- গৌর, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পায়ে চটিজুতো, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মোটা চাদরের ফাঁক দিয়া শুভ পৈতার গোছা দেখা যাইতেছে।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশে সাধু গদ্যে এটি ভাষাকে ছাপিয়ে ছবি হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের অন্যত্র সাধুগদ্যের ব্যবহার স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে এভাবে-

"তখন শরৎকালের অবসানে সরস্বতীর জলধারা শীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল এবং তীরের উপর দিয়া কৃষকদিগের গমনাগমনের পথটিও পায়ে পায়ে শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এই পথের উপর দিয়া আজ- অপরাহ্ন বেলায় বিজয়া বৃদ্ধা দারোয়ান কানহাইয়া সিংকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ওপারের বাবলা বাঁশ খেঁজুর প্রভৃতি গাছপালার ফাঁক দিয়া অস্তগমনোমুখ সূর্যের আরক্ত আভা মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে।"

উপসংহার

শরৎচন্দ্রের সময়কালের লেখকদের লেখায় শরৎ মানসিকতার অভাব দেখা যায়। তারা শরৎচন্দ্রের আদর্শ অবলম্বন করে। সমালোচক মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায় লিখেছেন - "আধুনিক সাহিত্যের কল্যাণে আজ আমাদের অনেক জিনিস জানা সম্ভবপর হয়েছে। নারী আজ তার সতীত্বের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবিদ্ধ নয়। এখন আমাদের মনের মধ্যে এই কথা জাগ্রত হয়েছে, যে নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়? শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে এর নির্ভীক উত্তর পেয়ে পাঠকের মন সভয় বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।" এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন- "কথা ছিল। শিল্প ছিল, ছিল না দরদ, অপরের মনের কথাটি বুনিয়া ফিরিয়া বাছিয়া হয়তো বলা হইয়াছিল, কিন্তু সে শুধু অনুভূতির বহিরঙ্গ স্পর্শ করিত। জীবানন্দ, ষোড়শী, অভয়া, আলো, বামুনের মেয়েটি আর কিরণময়ী - ইহারা আছে বলিয়াই জানিতাম। এ ছাড়া আরো আছে এবং সাহিত্যে তারা দেখা দিবেনও।" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের প্রতি ঋণ স্বীকার করে বলেছেন - "বাঙালী জীবনের সাহিত্যের ভাবধারায় শরৎচন্দ্রই আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাবধারা। "শরৎচন্দ্রের পরবর্তী সময়ের লেখকরা কথাসাহিত্যিকের প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন। শরৎচন্দ্রের জন্য বাংলা উপন্যাসের পালাবদল ঘটেছিল। প্রথাবদ্ধ শব্দাবলী, বাক্যবন্ধের পরিবর্তে নতুন নতুন শব্দ ও প্রকাশ রীতির প্রবর্তন ঘটে। এক কথায় শরৎচন্দ্রের ভাষাভাবনা উত্তরকালের লেখকদের ভাষা ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল।

তথ্যসূত্র :

- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী আচার্য জগদীশ বসু রোড, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৫৮৬।
- সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যে গদ্য; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ ১৩৪১, আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ৭৭।
- চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা: বঙ্কিম রচনাবলি, প্রথম বহু সাহিত্য সংসদ, ৩২, এ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৬০, নবম প্রকাশ ১৩৮৭, পৃ. ১২৩।
- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি; বিশ্বভারতী; ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা – ১৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।

National Conference on
Latest Innovations in Engineering, Science, Management and Humanities (NCLIESMH- 2024)
26th May, 2024, Raipur, Chhattisgarh, India.

- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গোরা; ঐ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০ ৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ: ১৯১৯ (উৎস সুত্র: বাংলা রীতির ইতিহাস; অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী গুটি, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭৪, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ২১৮।
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস; ঐ; পৃ. ২৯৯।
- সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র, শরৎচন্দ্র; এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি.; কলকাতা - ১২, একাদশ সংস্করণ, ১৩৮১, পৃ. ৮১।
- চট্টোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর: ১৩, রক্তিম চ্যাটার্জী ঘাট; কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১১৬২, পরিবর্ধিত প্রথম দেজ সংস্করণ ১৯৮০, পৃ. ৫০।
- সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যে গদ্য। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ১, প্রথম সংস্করণ ১৩৪১, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ১৭৪।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড় দিদি-শরৎ সাহিত্য সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৯; ১৩৯৩, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০২, পৃ. ১।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎজ্ঞ, বড় দিদি ঐ পৃ. ১ ১৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড় দিদি, ঐ; পৃ. ১।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজ বৌ, ঐ; পৃ. ২০।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজ বৌ: ঐ, পৃ. ৩০১।